ইন্দ্র মুভিটোনের-
19-12-41
রাখাল কন্যা

ইন্দ্র মুভিটোনের মর্ম্মস্পর্শী সমাজ কথাচিত্র

চিত্র-নাট্য, কাহিনী ও পরিচালনা ঃ **নিরঞ্জন পাল**

প্রণয়ের ব্যর্থতা যখন পুরুষের জীবনে প্রজ্জ্বলিত করে নিদারুণ প্রতিহিংসার বহ্নি—তখন সেই অনলের গ্রাস হইতে কে রক্ষা করে অসহায় নারীকে? এমনি একটি হতভাগ্য কিশোরীর দুর্বহ জীবনের বেদনা-মথিত অশ্রুসজল কাহিনী আপনাদের হৃদয় বিগলিত করিবে।

ইন্দ্র মুভিটোন কলিকাতা

—মুক্তিদাতা—

রায় সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩ন সিনাগগ্ ষ্ট্রীট ঃ কলিকাতা ঃ ফোন ঃ বি, বি ৪৯৭.

Mohondas Banerjee.

কাহিনী

বিধাতা শিবানীকে গড়েছিলেন মেয়ে ক'রে, কিন্তু প্রকৃতিটা তার বোধকরি দিয়েছিলেন বালকের।

মা-মরা এই দুরন্ত চঞ্চল মেয়েটির খেলার সাথী হচ্ছে গাঁয়ের যত ছোট-লোকের ছেলেরা। তাদের সাথে দল বেঁধে সে ড্যাংগুলি খেলে, যায় পরের পুকুরে মাছ চুরি করতে, নষ্টচন্দ্রের রাতে বাগানে ফল পাড়তে। তাই পাড়ায় তাকে সবাই বলে—'ডাকাত মেয়ে'!

যে-বয়সে সাধারণ মেয়েদের মনে স্বামী আর সংসার সম্বন্ধে একটা চেতনা জাগে, শিবানী সেই বয়সে পা দিয়েছে বটে, কিন্তু বিবাহ বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা তার মনে জাগেনি এখনো। নিজেকে বধূরূপে—পুরুষের প্রিয়ারূপে কল্পনা করে কোনোদিনও সে মধুর রোমাঞ্চ অনুভব করেনি। সে যেন ঘুমিয়ে-থাকা রাতের মুকুল! ক'বে উষার আলোয় জাগবে কে জানে!

শিবানীর বাপ মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজে বেড়ান, কিন্তু খুঁজলেই ত' আর পাত্র মেলে না! একে গরীবের মেয়ে, তা'য় দুরন্ত চঞ্চল স্বভাব কে তাকে বরণ করে ঘরে আনবে?

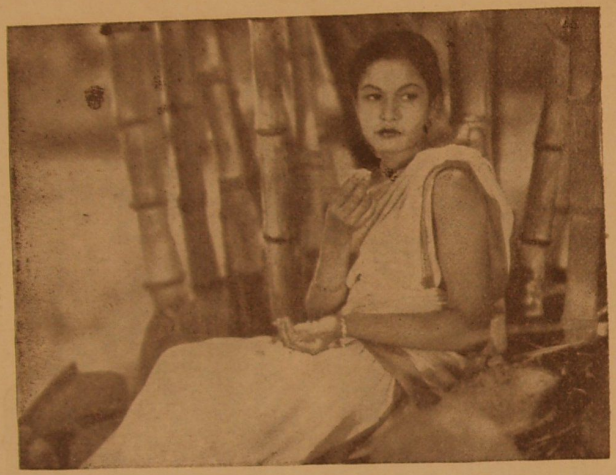

শেষে ভিনগাঁয়ে একটি সম্বন্ধ জুটল। পাত্রের বাপ আসবেন মেয়ে দেখতে। খবরটা শুনে শিবানী খুসী হ'ল না মোটেই। কারণ, ভিনগাঁয়ে বিয়ে হলে তাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, সুতরাং খুসী হওয়ার কথা নয়। শিবানী মহা ভাবনায় পড়ে গেল। আর ভাবনা তার খেলার সাথীদেরও হল। শিবানীর প্রায়-সমবয়সী সাথী রতন এ-সমস্যার সহজ মীমাংসা করে, বলে—তুই ভাবিস্‌নি শিবি, আমি তোকে বিয়ে করবো। কিন্তু শিবানী হেসে বলে—দূর্! তা কেমন করে হ'বে? আমি বামুনের মেয়ে আর তুই যে জেলের ছেলে!

রতন বলে, ও! মনেই থাকেনা যে আমি জেলের ছেলে!·····

ভিনগাঁ থেকে বরের বাপ এসেছেন মেয়ে দেখতে। কিন্তু সেই সময় শিবানীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় জমিদারের একজন পাইক এসে শিবানীর বাপকে জানাল যে জমিদার তাঁকে তলব করেছেন। কারণ, জমিদারের সখের রাজহাঁসকে শিবানী ড্যাংগুলি খেলতে খেলতে মেরে ফেলেছে। শিবানীর বাপ ছুটলেন জমিদারের পাইকের সাথে।

জমিদারের পাইক শিবানীকে আগেই জমিদারের সুমুখে হাজির করেছিল। এমন দুরন্ত-দুঃসাহসী মেয়ে তিনি আর কখনো দেখেন নি। এ যেন চঞ্চলা-

বন-হরিণী—শাসন মানে না, ভয় জানে না!

শিবানীর বাপকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে জমিদার বল্‌লেন, মেয়ের বিয়ে দেন না কেন?

দরিদ্র ব্রাহ্মণ জানালেন—তাঁর এই মেয়েটাকে কেউ ঘরে নিতে চায় না।

জমিদার তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে,—শিবানীকে তিনি নিজেই বিবাহ করবেন।

শিবানীর নব-মুকুলিত রূপযৌবন জমিদারের মনে কোন মোহ জাগিয়েছিল কিনা বলা যায় না, তবে সত্যিই তাঁর আগ্রহ হয়েছিল এই দুরন্ত বুনো-পাখীকে পোষ মানাতে। তাই তিনি গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে শিবানীকে বিনা যৌতুকেই বিবাহ করতে চাইলেন।

শিবানী এ প্রস্তাবে খুসীই হ'ল। কেন না জমিদারের সাথে বিয়ে হ'লে তা'কে গ্রাম ছেড়ে—খেলার সাথীদের ছেড়ে চলে যেতে হবে না।

বিবাহের দিন উপস্থিত। জমিদার বাড়ী থেকে সকালবেলা ভারে ভারে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসছে। সবাই ব্যস্ত! কিন্তু শিবানীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগে প্রতিবেশিনী ময়নার সঙ্গে শিবানী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল। শিবানী যখন জলে নেমেছে তখন দেখা গেল, রতন তার ডিঙি বেয়ে চলেছে।

তাড়াতাড়ি সাতার কেটে সে রতনের ডিঙিতে গিয়ে উঠে বলে—চল্‌না রতন, দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসি।

রতন বলে—আজ যে তোর বিয়ে!

শিবানী উত্তর দেয়—বিয়ে ত' সেই রাত দুপুরে। ততক্ষণে একটু বেড়িয়ে আসি চল্‌। বিয়ের পর আর বেড়াতে পাব কিনা কে জানে!

রতন আর কিছু না বলে তার প্রিয় গানটি গাইতে গাইতে ডিঙি বেয়ে গঙ্গার বুকে ভেসে চল্‌ল মনের আনন্দে:

"সাত-মহলা স্বপন-পুরী সাত সাগরের শেষ,
(ও তার) কোথায় ঠিকানা?....."

হঠাৎ গান থামিয়ে রতন চীৎকার করে বলে—জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটরে শিবি—গঙ্গায় বান আস্‌চে! দেখতে দেখতে বন্যার ঢেউ এসে তাদের ছোট্ট ডিঙিটা দিল উল্‌টে, বানের মুখে স্রোতের ফুলের মত তারা ভেসে গেল কোথায় কে জানে!

এদিকে গ্রামে রটে গেল যে, বিয়ের দিন শিবানী জেলের ছেলে রতনের সঙ্গে পালিয়েছে।

অপমানিত জমিদার শিবানীর বাপকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে তাঁর পৈতৃক ভিটেয় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

ওদিকে রতন আর শিবানী স্রোতের ফুলের মতো ভাস্‌তে ভাস্‌তে জনমানবহীন এক অজানা চরে এসে উঠল। নিরুপায় নিরাশ্রয় শিবানী ভাবতে লাগল,—এখন উপায়? আজ যে তার বিয়ে! বাড়ীতে এতক্ষণ উৎসবের সাড়া পড়েছে, আর অদৃষ্ট তা'কে কোথায় নিয়ে এল! ভয়ে আর ভাবনায় ত'ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হঠাৎ রতন দেখতে পেল, কূল থেকে খানিকটা দূরে তার সেই উল্‌টানো ডিঙি জলে ভাস্‌ছে!

রতন ছুটল সেইদিকে, শিবানী রইল একা।

এমন সময় চরের পিছন দিকের তীরে একখানা ষ্টীন-লঞ্চ এসে থামল। ব্রীচেস্‌-পরা গলায় স্কার্ফ-বাঁধা একটি লোক নামল সেই চরে। নাম তাঁ'র চন্দ্রনাথ। অবিবাহিত ধনী ব্যক্তি, এই চরের মালিক। এখানে একটি মর্ম্মর-সৌধ তিনি তৈরী করিয়েছেন, মৃত্যুর পর তাঁ'র মৃতদেহ এই সৌধের ভিতরে শ্বেতপাথরের একটা বেদীর উপর রেখে দেওয়া হবে—এই তাঁ'র শেষ সাধ।

নির্জ্জন সেই চরে শিবানীকে দেখে চন্দ্রনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তা'কে প্রশ্ন করেন—কে তুমি? এখানে কেমন করে এলে?

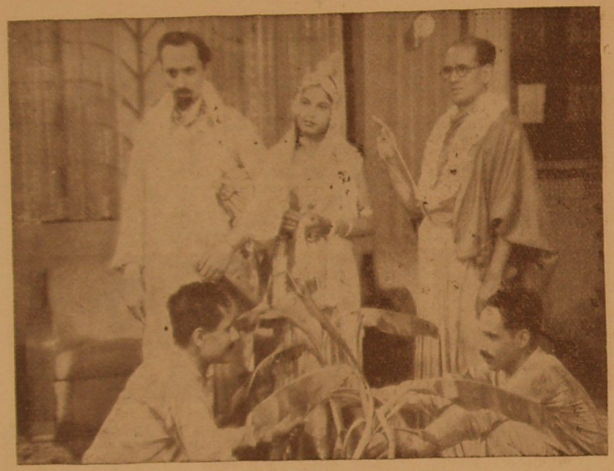

শিবানী তখন তা'কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

চন্দ্রনাথ শুনে নিজের ষ্টীম-লঞ্চে করে তা'কে গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে রাজী হ'লেন। কিন্তু তা'র সঙ্গী রতন কোথায়? রতনের জন্যে বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে শিবানীর ধারণা হয়েছিল যে, তা'কে নিশ্চয়ই হাঙ্গরে ধরে নিয়ে গেছে। অগত্যা সে একাই চন্দ্রনাথের ষ্টীম-লঞ্চে ক'রে গ্রামে ফিরে চল্‌ল।

এদিকে বহু-চেষ্টায় ডিঙিটাকে সোজা ক'রে ভাসিয়ে রতন যখন চরে ফিরে এল, শিবানী তখন আর সেখানে নেই! শূন্য চরে রতনের ব্যাকুল ডাক বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে তা'র নিজের কানেই ফিরে আসে। দুঃখে, হতাশায় রতন ভেঙ্গে পড়ল,—শিবানীকে হারিয়ে সে একা ফিরবে কেমন ক'রে?.....

* * * * *

গ্রামে কিন্তু শিবানীর ঠাঁই হ'লনা। সবাই ভাবলে শিবানী কুলত্যাগিনী, ভ্রষ্টা। অতএব তাকে ঘরে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

পলাতকা শিবানী গাঁয়ে ফিরে এসেছে শুনে জমিদার হুকুম দিলেন, নচ্ছার মেয়েটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বের করে দাও—

কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিলেন চন্দ্রনাথ—এবং তা'র ফলে জমিদারের দলের সঙ্গে চন্দ্রনাথের লঞ্চের লোকজনের মারপিট সুরু হ'ল। চন্দ্রনাথ ব্যাপারটা গুরুতর দেখে পকেট থেকে পিস্তল বের ক'রে জমিদারকে

দেখাতেই জমিদার দলবল নিয়ে প্রাণের দায়ে সরে পড়লেন। সহায় সম্বলহীনা শিবানী দাঁড়িয়ে ভাবছে কোথায় সে যাবে। কিন্তু ভাবতে তা'কে আর হ'ল না, শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথের প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে অসহায়া শিবানী পেলো আশ্রয়। শুধু আশ্রয় নয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি শিবানীর জন্যে ক'রে দিলেন। তবু গ্রামের মেয়ে শিবানী এই সহরে আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। বনের হরিণীকে যেন খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে! মাঝে মাঝে তা'র মনে পড়ে তা'দের সেই গ্রাম, আর মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া সাথী রতনকে।

দিন যায়।.....

অবিবাহিত চন্দ্রনাথ, জীবনের অনেকগুলো বছর একা একা নিজের খেয়ালেই কাটিয়েছেন। শিবানী তাঁ'র জীবনে আসার পর থেকে তাঁর শূন্য মন-বনে যেন বসন্তের বাঁশী বাজতে সুরু হ'ল। নির্জ্জন সেই চরে সমাধি-মন্দির গড়ে এতদিন তিনি মরণের স্বপ্নেই বিভোর হয়েছিলেন, কিন্তু অন্ধ যৌবনের প্রান্তে এসে জাগল জীবনের আকাঙ্খা—প্রেমের তৃষ্ণা। তাই তিনি শিবানীকে বিবাহ করতে চাইলেন। চন্দ্রনাথের প্রস্তাবে শিবানীর কোন আপত্তি হ'ল না। কারণ—চন্দ্রনাথ জাতে বামুন; সুতরাং এ বিবাহে বাধা কি? চন্দ্রনাথ অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিয়ের পর তুমি আমায় ভালোবাসতে পারবে ত' শিবানী?

কিন্তু ছোটবেলা থেকে শিবানী শুধু জানে যে, ঘর-সংসার করার জন্যেই মেয়েদের জন্ম। বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন ধারণা তার ছিলনা। তাই সে অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল—বিয়ের সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ কি?

তাঁর প্রশ্নের এই সরল জবাব শুনে চন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—সম্বন্ধ আছে বৈকি! মাটির সঙ্গে ফুলের যেমন সম্বন্ধ।

* * * * *

বিবাহ হয়ে গেছে। কিন্তু চন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, কাছে থেকেও শিবানী যেন দূরে রয়েছে! শিবানীকে আরো নিবিড় ক'রে পাওয়ার আশায় তিনি বার বার ত'ার কাছে এগিয়ে যান, আর অতৃপ্ত প্রেমের তৃষ্ণা নিয়ে বার বার ফিরে আসেন।

তবু চন্দ্রনাথ ধৈর্য হারালেন না। তিনি ভাবলেন শিবানীর মনে প্রেমের মুকুল এখনো ফোটেনি। যতদিন না ফোটে, ততদিন তিনি অপেক্ষা করবেন।···

ওদিকে রতন আজো সেই চরে ঘুরে বেড়ায়। শিবানীকে হারিয়ে দুঃখে বেদনায় সে হয়ে উঠেছে ঠিক পাগলের মতো।

চন্দ্রনাথের দু'জন চাকর একদিন চরে গিয়ে তা'কে দেখতে পায়। তা'রা নিরাশ্রয় পাগল বলে তা'কে নিয়ে আসে চন্দ্রনাথের বাড়ীতে। নীচে গ্যারেজের কাছে বসে রতন আপন মনে উদাস কণ্ঠে তখন সেই প্রিয় গানটি গায়—

"সাত মহলা স্বপন-পুরী সাত সাগরের শেষ
(ও তার) কোথায় ঠিকানা?"

শিবানী দোতলার ঘর থেকে রতনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই আনন্দে অধীর হয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে নেমে আসে নীচে।

"রতন তুই? তোকে তা'হলে হাঙ্গরে ধরেনি?"

"শিবানী তুই এখানে!" রতন যেন স্বর্গ ফিরে পেল।

যে নিয়তি একদিন সহসা তা'দের মাঝখানে বিচ্ছেদের যবনিকা সৃষ্টি করেছিল, সেই নিয়তি আজকে আবার দুজনকে কাছে এনে মিলিয়ে দিল।

চন্দ্রনাথ এই আনন্দের দৃশ্য দেখলেন বটে, কিন্তু মনে হ'ল, তাঁর মুখে কিসের যেন একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। তবু রতন তার গৃহেই আশ্রয় পেল।

কিন্তু মানুষের অবচেতনার স্তরে যে কি প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে, কে তার খবর রাখে?

চন্দ্রনাথ লক্ষ্য করতে লাগলেন, রতনকে ফিরে পেয়ে শিবানীর সুখের নদীতে যেন জোয়ার এসেছে! চন্দ্রনাথ ভাবেন—মন্ত্রের বাঁধন দিয়ে তিনি যে হৃদয় লাভ করতে পারেননি, সামান্য একটা জেলের ছেলে রতন অতি সহজেই তা' জয় ক'রে নিয়েছে! হৃদয়ের খেলায় তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

পরাজয়ের এই গ্লানি, অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা, সংযত-চরিত্র উদার-হৃদয় চন্দ্রনাথকে করে তুলল অধীর। এতদিন যেখানে ছিল প্রেমের উদারতা, আজ সেখানে এল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিহিংসা·····।

* * * * *

চন্দ্রনাথ আর শিবানীর বিবাহের পর একমাস পূর্ণ হয়েছে। চন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন—এই উপলক্ষে সবাই মিলে সেই চরে গিয়ে চড়ুই-ভাতি করা যাক্।

শিবানীকে নিয়ে চন্দ্রনাথ যখন সমাধি-মন্দিরের কাছে এসে পৌছলেন, ঠিক তা'র আগেই চাকরেরা রতনকে নিয়ে সমাধি-মন্দিরে আবদ্ধ করেছে। শিবানী রতনকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে—রতন কই?

চন্দ্রনাথ উত্তর দেন—এইখানে কোথাও আছে হয়ত'। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সমাধি-মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

শিবানী জিজ্ঞাসা করে—ওকি! সমাধি মন্দিরের মধ্যে কে?

চন্দ্রনাথ তখন ক্রুর হাসি হেসে বলেন—রতন!

ভয়ে বিস্ময়ে শিবানী বলে—রতনকে বন্ধ করে রেখেছ কেন?

"কেন শুনবে"? চন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন,—"আমার বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও তুমি দিনের পর দিন ওরই স্বপ্ন দেখেছ, তাই আজ আমার হুকুমে চাকরেরা রতনকে সমাধি-মন্দিরে বন্ধ করে রেখেছে।····· তিলে তিলে দম বন্ধ হয়ে ও মরবে, আর বাইরে থেকে তুমি শুনবে ওর বুক-ফাটা মরণ-কান্না!"

শিবানী কেঁদে মিনতি ক'রে বলে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি রতনকে তুমি ছেড়ে দাও! তুমি যা বলবে তাই ক'রব—

চন্দ্রনাথ বলেন—বেশ তা'হলে আমাকে তোমার বুকে টেনে নাও,—বল, রতনকে তুমি ভুলে গেছ।

নিতান্ত সরলপ্রকৃতির এই মেয়েটি অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে বলে—ভুলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ভুলতে ত' পারছিনা! ছোটবেলা থেকে যা'র সাথে একসঙ্গে খেলা করেছি যা'কে ভালবেসেছি তা'কে কি এত সহজে ভোলা যায়? কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, রতনকে আমি ভুলতে চেষ্টা ক'রব।

কিন্তু নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার মোহে চন্দ্রনাথ তখন বিবেকহারা, তাই তিনি শিবানীকে পদাঘাত করে সে ষ্টীম-লঞ্চে গিয়ে উঠলেন। চলে' যাবার সময় সমাধি-মন্দিরের চাবিটা ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে।

* * * * *

সমাধি-মন্দিরের মধ্যে রতন বন্দী। কেরোসিনের বাতির বিষাক্ত ধোঁয়ায় আর বাতাসের অভাবে তা'র শ্বাসরোধ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পাষাণ-পুরীর দ্বার ভাঙ্গবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

বাইরে থেকে নিরুপায় শিবানী কেঁদে বলে, তোর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, না রে রতন?

জোর ক'রে নিশ্বাস নিয়ে রতন ভিতর থেকে জবাব দেয়, আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা শিবানী! এই শোন আমি গান গাইছি—তুইও গা আমার সাথে। প্রাণপণে নিঃশ্বাস নিয়ে রতন সেই প্রিয় গানটি গায়—

"সাত মহলা স্বপনপুরী সাত সাগরের শেষ
(ও তার) কোথায় ঠিকানা?·····

রতনকে সাহস দেবার জন্যে বাইরে থেকে শিবানীও গান ধরে। কিন্তু ভয়ে পরিশ্রমে অবসাদে দুজনেরই চোখের সামনে তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে·····

* * * * *

ষ্টীম-লঞ্চ অনেকটা দূরে চলে গেছে। তা'র উপর দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথ। তাঁর চোখে তখন ভাসছে শিবানীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি, কাণে ক্রমাগত বাজছে তা'র করুণ মিনতি! তাঁর বিবেক যেন বলছে: এ তুই কি করলি?··· এ তুই কি করলি? নিষ্পাপ দু'টি প্রেমের মুকুলকে নিষ্ঠুরের মতো অকালে বৃন্তচ্যুত করলি!·····

* * * * *

তিনটি মানুষের জীবন নিয়ে খেয়ালী নিয়তি যে বিচিত্র খেলা করছিল, তা'র পরিণতি কি হ'ল?

চন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত কি চরে ফিরে এসেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা পাবেন রূপালী পর্দ্দায়।

শিবানী— (১)

যেদিন আমি রইব না গো
রইব না এই মাটির খেলাঘরে,
যা আছে মোর বিলিয়ে যাব
সারা ভুবন ভ'রে॥
(মোর) বসন্তেরই দিনগুলিরে
ফুলের বনে দেব ফিরে,
সেদিন আবার বকুল চাঁপা
ফুটবে থরে থরে॥
অন্ধ যা'রা, তা'দের দেব পাখীর কলগীতি,
(আর) দাদুমণির চোখে দেব শিশুকালের স্মৃতি।
যা'রা আমার খেলার সাথী, তা'দের দেব জ্যোছনা-রাতি,
রেখে যাব ভোরের আলো আঁধার রাতের তরে॥

(২)

শিবানী—

আজকে বিয়ের সানাই বাজে
সবার মুখে হাসি।
দই সন্দেশ নিয়ে এলো
বিয়ে বাড়ীর দাসী।
ওরা সাজায় বরণডালা
কপালে মোর শুধুই খিদের জ্বালা,
(আজ) সবার পাতে দই সন্দেশ
আমিই উপবাসী।
আয়রে "ভুলো" আয়রে "মেণি" তোরাই আমার সাথী,
আজকে আমি তোদের দলে তোদের ব্যথার ব্যথী।
আয় না মোরা আঁস্তাকুড়ে জুটে
চুরি-করা আনন্দ নিই লুটে,
ও "মেণি"! তুই উলু দেরে, "ভুলো" বাজা বাঁশী।

(৩)

রতন—

আঁকা বাঁকা পথ বুঝি তার' শেষ নাই।
সারা দিন আমি তাই সারি-গান গেয়ে যাই।
এই পথ কত ঘুরে
গেছে আমার স্বপন-পুরে—
রূপালি তারার যেথা ঝিকিমিকি রোশনাই।
পথ-চাওয়া মোর বুঝি তা'রও শেষ নাই,
(যদি) এই নায়ে কোনদিন তোরে সাথী পাই!
তোরে নিয়ে ভাটি-স্রোতে
(কবে) পাড়ি দেব এই পথে,
নাওখানি মোর একা একা বেয়ে চলি তাই।

রতন ও শিবানী—

(৪)

রতন—সাত মহলা স্বপন-পুরী সাত সাগরের শেষ—
ও তার কোথায় ঠিকানা ?
শোন্‌লো সোনার মেয়ে সোনার তরী বেয়ে
দুজনে যাব সেই দেশ, ঠিকানা নাই বা জানা।
শিবানী—যেথা রঙিন মধুমাসে রাঙা ফুল-পরীরা হাসে
আর বাঁকা চাঁদের ছবি আঁকা নীল আকাশে,
(সেথা) জোছনা রাতে তোরই সাথে ঘুমিয়ে রব
(পেতে) ফুলের বিছানা।
উভয়ে—দু'জনে যাব সেই দেশ ঠিকানা নাই বা জানা।
রতন—আমরা দু'টি পাখীর মত বাঁধব সেথায় বাসা—
এই ত' আমার আশা, শুধু এইত' আমার আশা।
বনের মাঝে পথ নিরালা,
তুলব কুসুম গাঁথব মালা—গাঁথব রে···
(যেথা) বাসলে ভাল করে না মানা,
কেউ করে না মানা—
উভয়ে—দু'জনে যাব সেই দেশ ঠিকানা নাই বা জানা।

রতন—

(৫)

নয়নজলের গহীন গাঙে
ডুবেছে মোর তরী,
সোনার মেয়ে স্বপ্নে শুধু
তোরেই খুঁজে মরি।
ময়ূরপঙ্খী নায়ে ছিল রঙিন আশার পাল,
কখন এলো ঝড়ের আঁধি ভাঙ্গল আমার হাল,
এখন ভাঙ্গা তরী ভাসিয়ে দিয়ে
কোন কূলে ঘর গড়ি।

রতন—

(৬)

হারিয়ে গেছে গো আমার মনের সাথী।
ও তার আসার আশায় কাটে আমার
সারাটি দিন রাতি।
হেথা চাঁদ ওঠে না, ফুল ফোটে না তাই,
বাতাস কেঁদে বলে সে ত' নাই নাই—
সে ত' নাই!
আমি আকাশ-কুসুম দিয়ে তবু
আজও মালা গাঁথি।

ইন্দ্র মুভিটোনের

ভীষ্ম

পরিচালনা ঃ **জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভার্গবের অতুলনীয় যুদ্ধ কাহিনী ! একদিকে ভীষ্ম—একদিকে ভার্গব একদিকে নারীর মর্য্যাদা—অন্যদিকে আভিজাত্যের দম্ভ ! ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের বিরোধ—ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষাত্রতেজের সংঘাত !

এ চিত্রে—

অম্বা তুলেছে একটা ঝড়—তার ধ্বংসলীলা দেখবে বলে ;
এনেছে একটা অগ্নি-প্রবাহ—তার ভস্মরাশি দেখবে বলে !
—মৃত্যুর আহবে ভীষ্মের রক্তধারায় স্নান করে সে উল্লাসে চীৎকার করে চেয়েছে "ভীষ্মের নিধন" !

●

আসিতেছে !

●

ইন্দ্র মুভিটোনের প্রচার বিভাগ হইতে অজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। এবং শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোম্পানী হইতে মুদ্রিত।

প্রণয়ের ব্যর্থতা যখন পুরুষের জীবনে প্রজ্জ্বলিত করে নিদারুণ প্রতিহিংসার বহ্নি — তখন সেই অনলের গ্রাস হইতে কে রক্ষা করে অসহায় নারীকে ?

এমনি একটি হতভাগ্য তরুণীর দুর্বহ জীবনের বেদনা মথিত কাহিনী !

ইন্দ্র মুভিটোনের নবতম সমাজচিত্র

কাহিনী ও পরিচালনা : নিরঞ্জন পাল
সংলাপ ও গীতি : প্রণব রায়
শ্রেষ্ঠাংশে : রেখা, জিতেন ও জ্যোতিকুমার

✻

১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার

শ্রীতে শুভারম্ভ

✻

১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৮॥টায় বুকিং অফিস খোলা হইবে। চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট একদিন অগ্রিম পাইবেন।

1941

আনন্দবাজার পত্রিকা

1941